শ্রীরামকৃষ্ণ এবং ধর্ম

'ধর্ম' বলতে সাধারণ মানুষ বোঝে তীর্থভ্রমণ, ব্রত-উপবাস, গঙ্গাস্নান, জপ-পূজা-ভজন ইত্যাদি কিছু অনুষ্ঠান, কিছু বিধি। সাধারণ মানুষের ধর্মভাবনা এর বাইরে কিছু নয়। ব্যক্তিজীবনে একজন মানুষ হয়তো অসৎ, চরম স্বার্থপর কিন্তু সে ভাবে ঐগুলি করলে সে ধর্মাচরণ করবে এবং সমাজে সে 'ধার্মিক' মানুষ বলে স্বীকৃতি পাবে। আবার একদল মানুষ আছে, যাদের সংখ্যাই বেশি, তারা মনে করে 'ধর্ম' মানে ম্যাজিক, যাদু। সাধু-সন্তরা একটু ছুঁয়ে দেবেন, ভূত-ভবিষ্যৎবলে দেবেন, একটা মাদুলি-কবচ দেবেন তাতে মামলায় জয় হবে, পরীক্ষায় সাফল্য আসবে ইত্যাদি। আবার 'ধর্ম' বলতে সাধারণতঃ আমরা 'ধর্মমত' বুঝি। যেমন হিন্দুধর্ম, বৌদ্ধধর্ম, খ্রীস্টানধর্ম, ইসলামধর্ম। মানুষকে আমরা এইরকম কোন না কোন ধর্মমতের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলি। আমরা নিজেরাও কোন না কোন ধর্মমতাবলম্বী বলে আমাদের পরিচয় দিই। বর্তমানকালের কোন কোন বিশিষ্ট চিন্তাশীল মানুষের কাছে ধর্ম ব্যাপারটাই অত্যন্ত নিন্দিত। তাঁরা বলছেন, ধর্ম মানুষকে বিভ্রান্ত করে, ধর্ম মানুষকে দুর্বল করে, কোন এক অদৃশ্য অস্তিত্বহীন শক্তির উপর নির্ভরশীল করে তোলে। তাই তাঁরা সাড়ম্বরে সব মানুষের জন্য ব্যবস্থাপত্র দিলেন : ধর্মকে জীবন ও সমাজ থেকে বিসর্জন দিতে হবে। কেউ হয়তো প্রতিবাদ করে বললেন, ধর্মের ভয় মানুষকে দুর্নীতিমুক্ত হতে সাহায্য করে, সৎ, নিঃস্বার্থপর হতে প্রেরণা দেয়। তাঁরা বললেন, আমরা এমন কঠোর আইন করব যে, প্রত্যেকে সৎ হবে, প্রত্যেকে স্বার্থশূন্য হবে। পৃথিবীর কোন কোন রাষ্ট্রে তার পরীক্ষাও চলেছে এবং চলছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : ধর্ম অনুশীলনের বস্তু, ধর্ম অনুভূতির বিষয়, ধর্ম উপলব্ধির ধন। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : তুমি উপবাস করলে কি করলে না, তুমি তীর্থে গেলে কি গেলে না, তুমি গঙ্গাস্নান করলে কি করলে না, তুমি পূজা-আহ্নিক করলে কি করলে না তার মধ্যে 'ধর্ম' সীমাবদ্ধ নেই। ধর্ম আরও বৃহৎ জিনিস, ধর্ম আরও মহৎ জিনিস। নিয়ম-বিধিকে একেবারে বর্জন করছেন না শ্রীরামকৃষ্ণ। তিনি বলছেন ওগুলি হলো বহিরঙ্গ। ওগুলি হলো গৌণ ব্যাপার। ছাদে ওঠার সিঁড়িমাত্র। ধর্মলাভের জন্য ওগুলির প্রয়োজন থাকতে পারে, কিন্তু ওগুলি ধর্ম নয়, ওগুলির মধ্যে ধর্ম নেই। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ফল দেখে আমরা গাছকে মর্যাদা দেব। যদি স্মৃতি-নির্দিষ্ট নিয়ম-বিধি পালন করে কেউ উদার হয়, প্রেমিক হয়, পবিত্র হয়, সত্যনিষ্ঠ হয়, অসূয়াশূন্য হয়, জিতেন্দ্রিয় হয়, তা হলেই নিয়ম-বিধি পালনের সার্থকতা। আসল কথা 'হওয়া'। শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'মানহুঁশ' হওয়া। সত্যিকারের মনুষ্যত্বের বিকাশ যখন হবে, নিজের স্বরূপ সম্পর্কে যখন উপলব্ধি আসবে

তখনই হবে ধর্মের বিকাশ। সত্যিকারের মনুষত্বের বিকাশ যেখানে, সেখানে মানুষ ও ঈশ্বরের মধ্যে আর কোন ভেদরেখা থাকে না। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন, ধর্ম মানুষকে 'মানুষ' করে, মানুষকে ঈশ্বরে পরিণত করে। বলছেন, 'বনত বনত বনি যাঈ'। ধীরে ধীরে 'হয়ে' যায়। স্বামীজীর ভাষায়'Being and becoming'–হতে থাকা এবং শেষে হয়ে যাওয়া। আইনের ভয়ে, পুরস্কারের প্রলোভনে মানুষকে এই 'হওয়ার' মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করা যায় না। তা প্রমাণিত সত্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : ধর্ম কোন যাদু নয়। কোন ম্যাজিক নয়। তিনি বলছেন, আমি নিজে আমার জীবনে পরীক্ষা করেছি। ধর্মপথে চললে সিদ্ধাই অর্থাৎ অলৌকিক ক্ষমতা, যাদু–ক্ষমতা, আসতে পারে। কিন্তু ধর্মের লক্ষ্য সিদ্ধাই লাভ করা নয়। সিদ্ধাই–এর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। সিদ্ধাই ধর্ম নয়। শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন : ধর্ম কখনো মানুষকে থামতে বলে না। বলে চলতে। বলে এগিয়ে যেতে। উপনিষদ্ যেমন বলছেন : 'চরৈবেতি'। চল, চল, এগিয়ে চল। শ্রুতি বলছেন : এগিয়ে চলাতেই রয়েছে জীবনের ছন্দ, জীবনের সুষমা, জীবনের অর্থ। ক্লান্তি আসতে পারে তাতে। কিন্তু সে ক্লান্তি হলো জীবনের শোভা, জীবনের রস। বলা হচ্ছেঃ শুয়ে থাকলে কলি, উঠে বসলে দ্বাপর, দাঁড়ালে ত্রেতা, আর চললে সত্য। যে চলে সেই থাকে। সেই মানুষ। শ্রীরামকৃষ্ণ তাই বলছেন : এগিয়ে চল। আরও, আরও, আরও। ছান্দোগ্য উপনিষদ বলছেন : 'নাল্পে সুখমস্তি'। অল্পে সুখ নেই। 'ভূমৈব সুখম্'। ভূমাতে অর্থাৎ বিরাটত্বেই সুখ। কোন যাদুমন্ত্রে মানুষ বড় হতে পারে না। বড় হয় মানুষ সাধনায়, বড় হয় অধ্যাবসায়ে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতে চাইছেন : ধর্ম হলো সেই বিজ্ঞান, পরীক্ষিত বিজ্ঞান–যা তিনি নিজে পরীক্ষা করেছেন, অপরকে পরীক্ষা করিয়েছেন–যা মানুষের কাছে এগিয়ে যাওয়ার রহস্য উন্মোচন করে, ভূমায় পৌঁছে দেওয়ার সূত্র বলে দেয়।

কোন কোন ধর্মে পাপবাদ একটি বিরাট ব্যাপার। তারা বলছেঃ তোমার সামনে দাউ দাউ করে জ্বলছে নরকের আগুন। পাপ, অন্যায় কিছু করলে মৃত্যুর পর ঐ নরকযন্ত্রণা তোমাকে ভোগ করতে হবে। শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : পাপ পাপ আবার কি? জীবনে ভুল করেছে, তখনই স্থির কর যে আর করবে না ঐ রকম ভুল, অন্যায়। আর চেষ্টা কর তোমার সঙ্কল্প রক্ষা করতে। এত সহজে এত বড় সমস্যার সমাধান স্বামীজী বলছেন : জীবনে একটা ভুল করেছ বলে চিন্তা করো না। নতুন করে আবার শুরু কর তোমার জীবন। জীবনে বাধা আসুক, তাতে ভয় পেওনা। তোমার ভাগ্যনির্মাতা তুমি নিজেই। যে নিজে উদ্যমী দৈব তার সহায়। অস্কার ওয়াইল্ডের একটি বিখ্যাত কথা আছেঃ"The only difference between a saint and a sinner is that every saint has a past and every sinner has a future."। এ শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবেরই প্রতিধ্বনি। স্বামী বিবেকানন্দও

ঐ একই কথা বলেছেন : মানুষের সঙ্গে পশুর পার্থক্য, সাধুর সঙ্গে পাপীর পার্থক্য–অজ্ঞানের পরিমাণের তারতম্যে। বলেছেন : গরু কখনো মিথ্যা কথা বলে না, দেয়াল কখনো চুরি করে না। মানুষ মিথ্যা কথা বলে, মানুষ চুরি করে, মানুষের জীবনে ব্যর্থতা আসে, মানুষ ভুল করে। কিন্তু মানুষই পারে আবার তার ভুল সংশোধন করে নতুন করে নিজেকে গড়তে। ধর্ম মানুষকে সেই প্রেরণা দেয় যাতে তার মধ্যে অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকশিত হয়, পূর্ণতার স্ফুরণ ঘটে।

ঈশ উপনিষদে বলা হয়েছে, যখন মানুষ নিজের মধ্যে সকলকে এবং সকলের মধ্যে নিজেকে দেখে তখনই যথার্থ পূর্ণত্বের বিকাশ হয় তার মধ্যে। এই পূর্ণত্বের বিকাশ সম্ভব, এবং এর বাস্তব রূপ আমরা দেখেছি শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে। তিনি একদিন ঘরে বসে আছেন, হঠাৎ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে উঠলেন। সকলে ছুটে এল। দেখল শ্রীরামকৃষ্ণ যন্ত্রণায় কাতর। মুখ ব্যথায় পাণ্ডুর হয়ে গিয়েছে। পিঠে সদ্য আঘাতের দাগ স্পষ্ট। সবাই ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা করল কে আঘাত করেছে তাঁকে। তিনি বললেন, তাঁকে কেউ আঘাত করেনি, দূরে গঙ্গায় একটি নৌকায় একজন মাঝি আরেকজন মাঝিকে মেরেছে। সেই আঘাত এসে লেগেছে তাঁর দেহে। আশ্চর্য ব্যাপার অথচ ঘটনা। একটি দুষ্টু ছেলে ফড়িং ধরে তার দেহে কাঁটা ফুটিয়ে দিয়েছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে ফড়িংটি। আর এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণ বোধ করছেন তাঁর দেহেও একই বেদনার অনুভূতি। একজন মাঠের মধ্যে কচি ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। শ্রীরামকৃষ্ণের মনে হলো যেন তাঁরই বুকের উপর হেঁটে যাচ্ছে সে। শুনতে অবিশ্বাস্য হলেও এ সবই ইতিহাস। শাস্ত্রে যে সর্বাবগাহী অহং–ভাবনার কথা বলা হয়েছে তা যে শুধু কথার কথা নয়, বাস্তবিক যে তা ঘটা সম্ভব তা আবার জগৎকে দেখানোর প্রয়োজন ছিল নতুন করে। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন তা–ই দেখাতে। এই ভাবনা বেদান্তের প্রাণকেন্দ্র। বেদান্তের সেই চিন্তাকে নতুন করে আমাদের সামনে তুলে ধরলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। নরেন্দ্রনাথ চেয়েছিলেন শুধু আত্মজ্ঞান লাভ করে নির্বিকল্প সমাধিতে ডুবে থাকতে। পৃথিবীর সঙ্গে তাঁর কোন যোগ থাকবে না। সেকথা শুনে অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কঠোর ভর্ৎসনা করে তিনি নরেন্দ্রনাথকে সেদিন বলেছিলেন : "ছি, ছি, তুই এত হীনবুদ্ধি তুই এত বড় আধার তো মুখে এই কথা আমি ভেবেছিলাম, কোথায় তুই একটা বিশাল বটগাছের মতো হবি। তোর ছায়ায় হাজার হাজার লোক আশ্রয় পাবে। তা না হয়ে তুই নিজের মুক্তি চাস এতো অতি তুচ্ছ হীন কথা। নারে, এত ছোট নজর করিস না।" তিনি সেদিন নরেন্দ্রনাথকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন শুধুমাত্র আত্মমুক্তির বাসনা তাঁর কাছে চরম স্বার্থপরতা। নরেন্দ্রনাথকে তিনি বলেছিলেন : "চোখ বুজলেই ভগবান আছেন আর চোখ চাইলেই ভগবান নেই?" অর্থাৎ শুধু সমাজ–সংসার থেকে বেরিয়ে গিয়ে

হিমালয়ের গুহায় ধ্যানের মধ্যে আমি ভগবানকে দেখব, আর আমার চোখের সামনে হাটে-মাঠে-বাজারে অসংখ্য মানুষ কেউ পীড়িত, কেউ আর্ত, কেউ ক্ষুধার্ত, কেউ মুর্খ তাদের মধ্যে আমি দেখব না সেই সর্বভূতান্তর্যামিকে? শ্রীরামকৃষ্ণের সেই শিক্ষার প্রতিফলন দেখি স্বামীজীর সেই বাণীতে :

"বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

সেই বোধের ফলশ্রুতি শ্রীরামকৃষ্ণের নামাঙ্কিত তাঁর নবীন ধর্মসন্দ্র স্থাপন। সেই সন্দ্র-প্রচারিত নবযুগধর্ম হলোঃ "আত্মনো মোক্ষার্থং জগদ্ধিতায় চ।" নিজের মুক্তির সঙ্গে বিশ্বমানবের কল্যাণ। ধর্মের জগতের মানুষ শ্রীরামকৃষ্ণ তাই জীবনের প্রয়োজনকে অবহেলা করেননি। মানুষের সুস্থ স্বাভাবিক জীবনের জন্য অন্নের প্রয়োজন। তা থেকে তাকে বঞ্চিত করার চেয়ে অন্যায় আর কিছু নেই। তাই তিনি বলতেন : "খালি পেটে ধর্ম হয় না।" কিন্তু তিনি জানতেন ভরা-পেট হলেই সব হয়ে যায় না। বরং দেহের অন্ন প্রাপ্তির সঙ্গে আরও একটি অন্নের প্রয়োজন হয়। তা আত্মার অন্ন। তারই আরেক নাম ধর্ম। শ্রীরামকৃষ্ণ এসেছিলেন এই দুটিকে মেলাতে-দেহের সঙ্গে আত্মাকে, লৌকিকের সঙ্গে লোকোত্তরকে, জীবের সঙ্গে শিবকে, মানুষের সঙ্গে দেবতাকে। আমাদের বিগত তিনহাজার বছরের ইতিহাসে শ্রীরামকৃষ্ণই প্রথম ধর্মকে জীবনমুখী করেছিলেন এবং জীবনকে ধর্মমুখী করেছিলেন। আগে আমরা জীবনে ধর্মের কথা অনেক শুনেছিলাম, কিন্তু জীবনকে ধর্মমুখী করতে পারিনি। আগে আমরা ধর্মকে জীবনমুখী করতে হবে তার নির্দেশ পেয়েছিলাম, কিন্তু আমাদের জীবনে ধর্ম জীবনমুখী হয়ে ওঠেনি। শ্রীরামকৃষ্ণের মহৎ অবদান তিনি এই দুটি মহাকার্য সম্পন্ন করেছিলেন তাঁর জীবন ও সাধনায়।

শ্রীরামকৃষ্ণের আরেকটি মহৎ অবদান তাঁর ধর্মসমন্বয়ের বাণী। তিনি বললেন : "যত মত তত পথ।" তিনি বললেন : সব মতই সত্য, সব পথই সত্য। তাঁর নিজের জীবনে তিনি পর পর বিভিন্ন ধর্মপথে সাধনা করেছেন-হিন্দু, ইসলাম, খ্রীস্টান। শেষে উপলব্ধি করেছেন : সব পথ দিয়েই একই গন্তব্যে মানুষ পৌঁছাচ্ছে। শুধু পথ আলাদা, যাওয়ার ভঙ্গি আলাদা। শ্রীরামকৃষ্ণ কোন ধর্মমত প্রচার করেননি। তিনি প্রচার করেছিলেন ধর্মকে, বলেছিলেন মত পথ নিয়ে 'মতুয়ার বুদ্ধি' কোর না। কারণ ধর্ম এক, ধর্মমত বিভিন্ন। সেই একই ধর্মকে হিন্দুরা বলছে হিন্দুধর্ম, মুসলমানরা বলছে ইসলামধর্ম, খ্রীস্টানরা বলছে খ্রীস্টানধর্ম। যতদিন পর্যন্ত বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে বিরূপতা দূর না হবে, ততদিন মানুষের মধ্যে কখনো স্থায়ী শান্তি আসতে পারে না। ভারতবর্ষ চিরকাল এই সমন্বয়ের বাণীই প্রচার করেছে। কোন্ প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের ঋষির কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল

সেই বাণীঃ "একং সদ্বিপ্রা বহুধা বদন্তি।" সত্য এক, ঋষিরা তাকে নানাভাবে ব্যাখ্যা করে থাকেন। ভারতবর্ষের ঋষির সেই শাশ্বত উপলব্ধি পুনর্বার শ্রীরামকৃষ্ণের সাধনায় মূর্ত হয়েছিল। তাঁর সমগ্র জীবন ও সাধনা ছিল সেই উপলব্ধির একাধারে সূত্র, ভাষ্য এবং ফলিত রূপ।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন : ধর্মই হলো সেই প্রক্রিয়া, সেই বিজ্ঞান যা মানুষকে নির্লোভ হতে, নিঃস্বার্থপর হতে, অসূয়াশূন্য হতে, পরম শত্রুর প্রতিও ক্ষমাশীল হতে প্রেরণা দেয়। পুরস্কারের প্রলোভন দেখিয়ে, শাস্তির ভয় দেখিয়ে মানুষকে যে সৎ করা যায় না শ্রীরামকৃষ্ণের এই বক্তব্যের সারবত্তা সমাজতন্ত্রী দেশগুলিতে প্রমাণিত হচ্ছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, 'ধর্ম' মানে কিন্তু ধর্মমত নয়। ধর্মমত হচ্ছে ধর্মে পৌঁছানোর পথ। উপায়। ধর্ম হচ্ছে মানুষের অন্তরের সমস্ত ঐশ্বর্যের বিকাশ, অন্তরের মধ্যে যে পূর্ণতা রয়েছে সহজাত, তার বিকাশ। ধর্মমত সাহায্য করে সেই বিকাশের প্রক্রিয়ায়। সব ধর্মের মূল কথাই হলো–তুমি পূর্ণ হও, তুমি দেবতা হও। ধর্ম মানে হওয়া। পূর্ণ তুমি আছই, দেবতা তুমি আছই–শুধু সেই সত্তার উন্মোচন কর তুমি। তুমি যে ধর্মমতেই আছ থাক। তা পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। অন্য ধর্মমতকে অশ্রদ্ধা করার দরকার নেই। কারণ ধর্ম হলো একটাই। সেই ধর্ম হলোTransformation–রূপান্তর। না, শুধু রূপান্তরই নয়, ধর্ম হলো উত্তরণTransfiguration, ক্ষুদ্র থেকে মহৎ–এ উত্তরণ। ধর্ম হলো সেই রূপান্তর ও উত্তরণের বিজ্ঞান। কি রকম রূপান্তর, কি রকম উত্তরণ? শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবকে ব্যাখ্যা করে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন : "From the Brute-man to the Buddha-man"–পশু–মানব থেকে বুদ্ধ–মানবে রূপান্তর–উত্তরণ। সেই রূপান্তর, সেই উত্তরণ যে সম্ভব তা নতুন করে জগৎকে দেখালেন শ্রীরামকৃষ্ণ।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ
অধ্যক্ষ ও সম্পাদক
রামকৃষ্ণ মঠ ও রামকৃষ্ণ মিশন, ঢাকা